বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প
(Resources and Industries of Bangladesh)

ইউনিট ১০

ভূমিকা

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে সেই দেশের সম্পদ ও শিল্পের উন্নয়নের উপর। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এছাড়াও কৃষিজ সম্পদ, বনজসম্পদ, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। পোশাক শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। এছাড়া রয়েছে পর্যটন শিল্প। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পর্যটন শিল্পও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

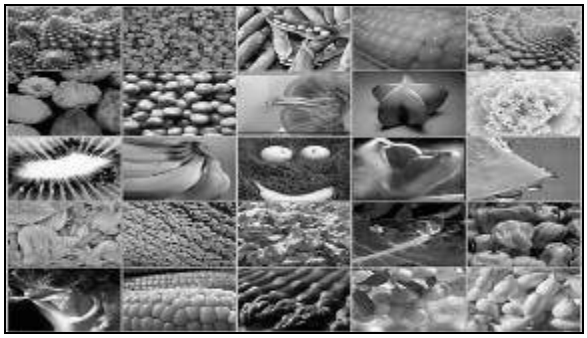

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১০.১ বাংলাদেশের প্রধান কৃষিপণ্য এবং বন্টন
পাঠ - ১০.২ বাংলাদেশের বনজসম্পদ এবং গুরুত্ব
পাঠ - ১০.৩ বাংলাদেশের খনিজসম্পদ এবং গুরুত্ব
পাঠ - ১০.৪ বাংলাদেশের প্রধান শিল্প ও বন্টন
পাঠ - ১০.৫ বাংলাদেশের পোশাক শিল্প
পাঠ - ১০.৬ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

পাঠ-১০.১ বাংলাদেশের প্রধান কৃষিপণ্য এবং বন্টন

(Major Agriculture Products of Bangladesh and Distributions)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে প্রধান কৃষিপণ্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন এবং
- □প্রধান কৃষিপণ্যসমূহের উৎপাদন ও বন্টন ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	কৃষিপণ্য।

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিপণ্য এবং বন্টন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি কৃষি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ। অন্যদিকে দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষিখাতে প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহ হচ্ছে হিমায়িত খাদ্য, কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় ৮৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মোট রপ্তানি আয়ের ৪.৫৩ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪)। বাংলাদেশের কৃষিজ ফসলকে প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. খাদ্যশস্য (ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, আলু, ভূট্টা, সবজি ও ফলমূল)।
২. অর্থকরী ফসল (পাট, চা, ইক্ষু, তুলা, তামাক ও ফুল)।

ধান (Rice) : বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। প্রধান তিন ধরনের ধান হচ্ছে আউশ, আমন ও বোরো। বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় ধান উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে রংপুর, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, বগুড়া দিনাজপুর, নোয়াখালী, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে ধান চাষ বেশি হয় (চিত্র-১০.১.১)। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে চাল আমদানির পরিমাণ ২.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪)।

ধান চাষের নিয়ামক

তাপমাত্রা : ধান চাষের জন্য ১৬° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাত : ধানের ফলন ভালো হওয়ার জন্য প্রয়োজন ১০০ থেকে ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত।

সেচ : সেচের মাধ্যমেও শুকনো মৌসুমে ধানের চাষ হয়।

মৃত্তিকা : নদী অববাহিকার পলিমাটি ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

গম (Wheat) : বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো গম চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এছাড়া দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে গম চাষ ভালো হয় (চিত্র-১০.১.১)। গম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি তাই প্রতিবছর গম আমদানি করতে হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে গম আমদানির পরিমাণ ২০.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪)।

গম চাষের নিয়ামক :

তাপমাত্রা : গম চাষের জন্য সাধারণত ১৬° থেকে ২২° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাত : গম চাষে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলেও চলে। সাধারণত গম চাষের জন্য প্রয়োজন ৫০-৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত। এ কারণে বাংলাদেশে বৃষ্টিহীন শীত মৌসুমে পানি সেচের মাধ্যমেও গম চাষ করা হয়।

মৃত্তিকা : বাংলাদেশের উর্বর দোআঁশ মাটি গম চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক।

অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে ডাল (মসুর, মুগ, মটর, মাসকলাই, খেসারি), তেলবীজ (তিল, সরিষা, বাদাম, তিসি) এবং ভুট্টা, যব, আলু, সবজি ও ফলমূল প্রধান।

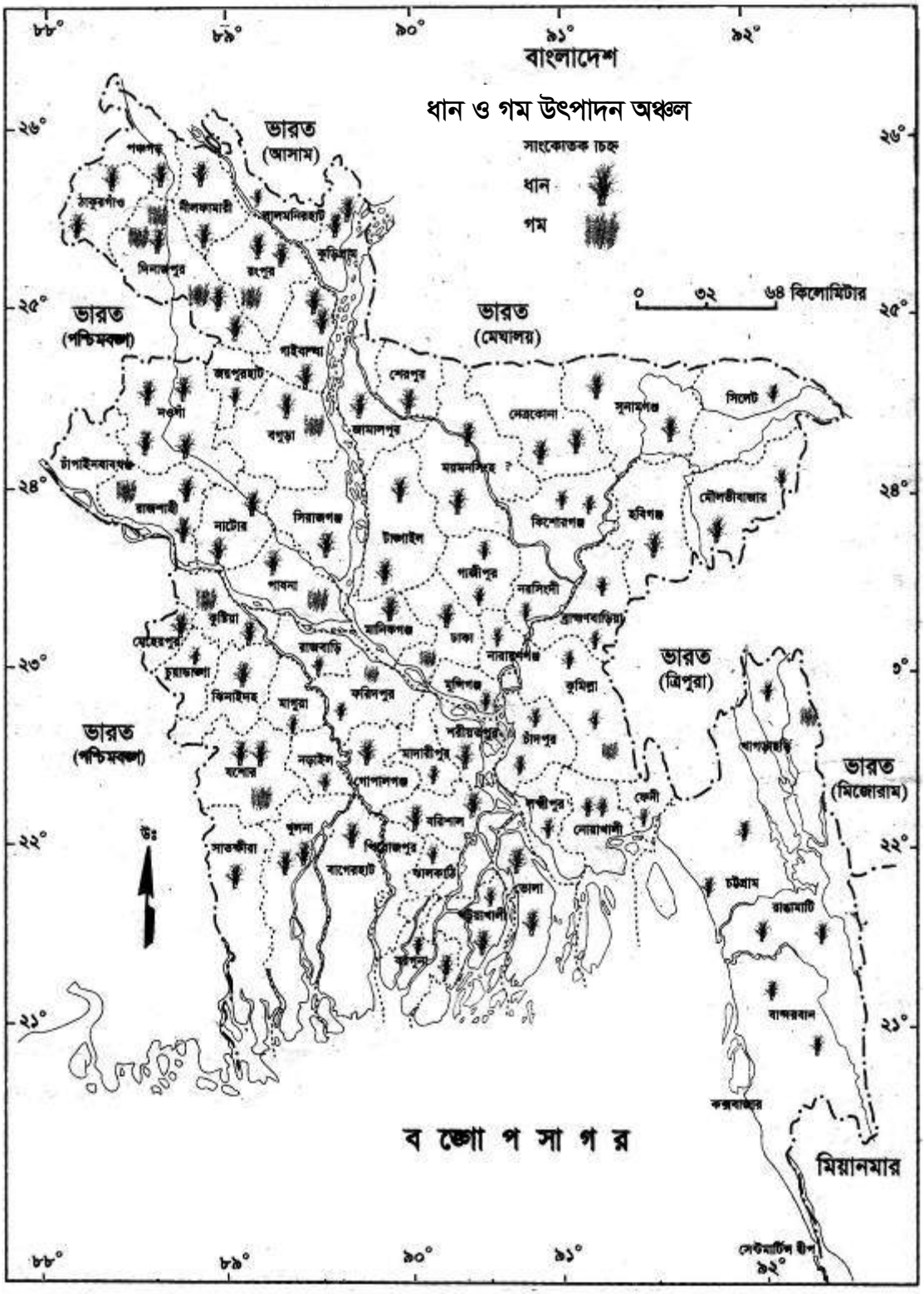

চিত্রঃ ১০.১.১ বাংলাদেশের ধান ও গম উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

অর্থকরী ফসল (Cash or Commercial Crops) : পাট, ইক্ষু, চা ইত্যাদিকে অর্থকরী ফসল বলা হয় কারণ এ সকল ফসল সরাসরি বিক্রির জন্য চাষ করা হয়।

পাট (Jute) : বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল হলো পাট। এদেশে সাধারণত দেশী ও তোষা নামক দুই প্রকারের পাট চাষ হয়। ময়মনসিংহ, রংপুর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল এবং পাবনা জেলায় পাট চাষ ভালো হয়।

পাট চাষের নিয়ামক

তাপমাত্রা : পাট চাষের জন্য অধিক তাপমাত্রা (২০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস) প্রয়োজন। এ কারণে পাটকে উষ্ণ অঞ্চলের ফসল বলা হয়।

বৃষ্টিপাত : পাট চাষে প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। সাধারণত ১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

মৃত্তিকা : বাংলাদেশের নদী অববাহিকার পলিযুক্ত দোঁআশ মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক।

ইক্ষু (Sugarcane) : সাধারণত সমতল ভূমিতে ইক্ষু চাষ হয়। ইক্ষু থেকে চিনি এবং গুড় তৈরি করা হয়। এছাড়া কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসাবে আখের ছোপড়া ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, যশোর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ইক্ষু চাষ ভালো হয়।

নিয়ামক :

তাপমাত্রা : ইক্ষু চাষের জন্য ১৯° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাত : নূন্যতম ১৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

মৃত্তিকা : বেলে দোঁআশ ও কর্দমময় দোঁআশ মাটিতে ইক্ষু চাষ ভালো হয়।

চা (Tea) : অর্থকরী ফসলের মধ্যে চা অন্যতম। বাংলাদেশে উৎপাদিত চা-এর কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। পানি নিষ্কাশনবিশিষ্ট ঢালু জমিতে চা ভালো হয়। চা চাষের জন্য ছায়া প্রয়োজন তাই বাগানের মাঝে মাঝে ছায়াবৃক্ষ রয়েছে। বাংলাদেশের মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেটে সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে চা চাষ করা হয়।

নিয়ামক :

তাপমাত্রা : চা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। ১৬° থেকে ১৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা চা চাষের উপযোগী।

বৃষ্টিপাত : চা চাষের জন্য ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

মৃত্তিকা : উর্বর লৌহ ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোঁআশ মাটিতে চা চাষ ভালো হয়।

প্রাকৃতিক নিয়ামক ছাড়াও মূলধন, শ্রমিক, পরিবহন, বাজার প্রভৃতি নিয়ামক কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ও বন্টনে প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় কোন কোন ধরনের কৃষিপণ্যের উৎপাদন ভালো হয়, এই সকল পণ্য উৎপাদনের জন্য ভৌগোলিক কারণসমূহ লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ। কৃষিজ ফসল মূলত দু'প্রকার। যথা- খাদ্যশস্য (ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, আলু, ভূট্টা, সবজি ও ফলমূল) এবং অর্থকরী ফসল (পাট, চা, ইক্ষু, তুলা, তামাক ও ফুল)। তন্মধ্যে প্রধান খাদ্যশস্য ধান এবং প্রধান অর্থকরী ফসল পাট। বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় ধান উৎপাদন হয় তবে নদী অববাহিকার পলিমাটি ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বাংলাদশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে গম চাষ হয় এবং উর্বর দোঁআশ মাটি গম চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক। অর্থকরী ফসলসমূহের মধ্যে দেশী ও তোষা নামক দুই ধরনের পাট নদী অববাহিকার পলিযুক্ত দোঁআশ মাটিতে জন্মে। সমতলভূমিতে ইক্ষু চাষ হয় এবং পানি নিষ্কাশনবিশিষ্ট ঢালু জমিতে চা চাষ ভালো হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন।

২. ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কত শতাংশ?
   ক. প্রায় ১২ শতাংশ খ. প্রায় ১৩ গ. প্রায় ১৪ শতাংশ ঘ. প্রায় ১৫ শতাংশ

৩. গম চাষের জন্য কত সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন ?
   ক. ৪০-৪৫ সেন্টিমিটার খ. ৪৫-৫০ সেন্টিমিটার গ. ৫০-৭৫ সেন্টিমিটার ঘ. ৭৫-৮০ সেন্টিমিটার

পাঠ-১০.২ বাংলাদেশের বনজ সম্পদ এবং গুরুত্ব
(Forest Resources of Bangladesh and its Importances)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- □বনজ সম্পদের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- □বনভুমির শ্রেণিবিভাগ লিখতে পারবেন;
- মানচিত্রে বাংলাদেশের বনজ সম্পদ চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- বনভূমির গুরুত্ব লিখতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	ক্রান্তীয় পাতাঝরা, ক্রান্তীয় চিরহরিৎ, স্রোতজ বনভূমি ।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

বনভূমি থেকে যে সকল সম্পদ পাওয়া যায় তাকে বনজ সম্পদ বলে। যে কোনো দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট ভূমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ২০১৩-২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ। মাটির গুণাগুণ ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের বনভূমিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

১. ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি।
২. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা গাছের বনভূমি।
৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন (চিত্র-১০.২.১)।

ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি : বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ যেমন ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর জেলার মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি, দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বরেন্দ্র বনভূমিকে ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি বলা হয়। এই বনভূমির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শীতকালে এই বনভূমির বৃক্ষের পাতা ঝরে যায় এবং গ্রীষ্মকালে আবার নতুন পাতা গজায় (চিত্র- ১০.২.১)।

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা গাছের বনভূমি : পাহাড়ের অধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং কম বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে পাতাঝরা গাছের বনভূমি দেখা যায়। বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের প্রায় সব অংশে এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কিছু অংশে এ বনভূমি বিস্তৃত (চিত্র- ১০.২.১)।

স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন : বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলা, পূর্বে হরিণঘাটা নদী, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলা এবং পশ্চিমে রাইমঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা নদী ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আংশিক প্রান্তসীমা পর্যন্ত এ বনভূমি বিস্তৃত। এটি খুলনা বিভাগের ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্রের জোয়ার ভাটা ও লোনা পানি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এ অঞ্চল বৃক্ষ সমৃদ্ধ (চিত্র- ১০.২.১)।

বনাঞ্চলের গুরুত্ব (Importance of Forest) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে বাংলাদেশে বনজ সম্পদের পরিমাণ সীমিত এবং দিন দিন কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বনজসম্পদের অবদান শতকরা প্রায় ৫ ভাগ। প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে বনভূমির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নে বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে বনভূমির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে বনভূমির গুরুত্ব : মাটি বা ভূমিক্ষয় রোধ, ভূমিধস রক্ষা, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, আর্দ্র আবহাওয়া, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। উপকূলীয় অঞ্চলের বনভূমি সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

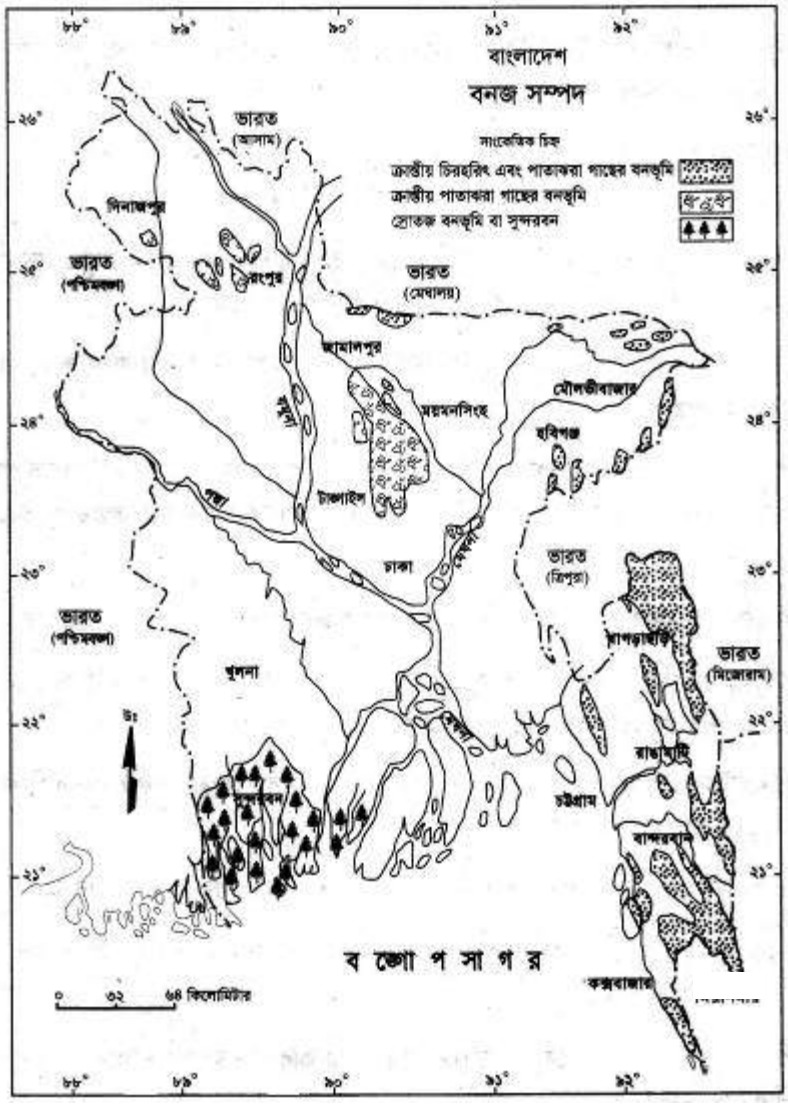

চিত্র- ১০.২.১ বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

শিল্প উন্নয়নে বনভূমির গুরুত্ব :

কাগজ শিল্প : রাঙ্গামাটি জেলার কর্ণফুলী কাগজের কল স্থানীয় বাঁশ সম্পদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সুনামগঞ্জের ছাতকে অবস্থিত কাগজ ও মন্ড তৈরির কারখানাটি সিলেটের সাবাই ঘাসকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে।

নিউজপ্রিন্ট কারখানা : সুন্দরবনের গেওয়া কাঠের উপর ভিত্তি করে খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানাটি গড়ে উঠেছে।

দিয়াশলাই শিল্প : সুন্দরবনের গেওয়া কাঠের উপর নির্ভর করে দিয়াশলাই শিল্প গড়ে উঠেছে। এছাড়া কদম ও শিমুল গাছের কাঠ এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

রেয়ন শিল্প : চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনার রেয়ন কারখানাটি স্থানীয় বনভূমির নরম কাঠ ও বাঁশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

পরিবহন শিল্প : বনভূমি থেকে প্রাপ্ত গর্জন, সেগুন, চাপালিশ, প্রভৃতি গাছের কাঠ রেলথের স্লিপার, রেলগাড়ির বগি, লঞ্চ, স্টিমার, নৌকা, বাস ও ট্রাকের বডি, বৈদ্যুতিক খুঁটি, রাস্তার পুল ইত্যাদি তৈরি করতে প্রয়োজন।

ভেষজ শিল্প : বনের গাছ-গাছড়া, লতাপাতা, মধু, প্রভৃতির উপর নির্ভর করে ভেষজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

চামড়া শিল্প : সুন্দরবনের গরান ও বাবুল গাছের বাকল চামড়া পাকা করার জন্য চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বাঘ, হরিণ, গুইসাপ, অজগর সাপ প্রভৃতি প্রাণীর চামড়াও শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পর্যটন শিল্প : পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, সুন্দরবন পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাময় স্থান। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জীববৈচিত্র্য পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনভূমির গুরুত্ব : বনভূমি থেকে প্রাপ্ত কাঁচামালের উপর গড়ে উঠা শিল্পসমূহ মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া বনজ সম্পদের উপর আরোপিত কর সরকারের রাজস্ব বাড়াচ্ছে। অপরদিকে বাংলাদেশের মূল্যবান সেগুন ও মেহগনি কাঠ, পশুর চামড়া, সাপের চামড়া. শিল্পের কাঁচামাল, প্রভৃতি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন গাছের নামও বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো। নাম ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে এই বৃক্ষগুলো কোন বনভূমির অন্তর্ভুক্ত তার নাম লিখুন।

গাছের নাম	বৈশিষ্ট্য	বনভূমির নাম
চাপলিশ, ময়না, তেলসুর, বাঁচ	গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না।	
সুন্দরি, গরান, গেওয়া, ধুন্দল, কেওড়া, গোলপাতা	স্রোতময় মিঠা ও নোনা পানির সংযোগস্থলে জন্মে	
শাল, গজারি, কড়ই, হিজল	গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যায়।	

সারসংক্ষেপ :

বনভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে বনজ সম্পদ বলে। বাংলাদেশের বনভূমিকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি যার প্রধান বৈশিষ্ট্য শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং গ্রীষ্মকালে নতুন পাতা গজায় এবং এই বনভূমি প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে দেখতে পাওয়া যায় ২। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ যা অধিক বৃষ্টিপ্রবণ পাহাড়িয়া অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় ৩। স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন যা বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের ৬০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এ বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নীচের অনুচ্ছেদটি লক্ষ্য করুন।

তাহসিনদের বাড়ী বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার মধুপুর অঞ্চলে। সে দেখে প্রতিবছর এ অঞ্চলের বনভূমিতে গ্রীষ্মকালে গাছের পাতা ঝরে যায় আবার শীতকালে নতুন পাতা গজায়।

১. এখানে কোন বনভূমির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে?
   ক) ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি খ) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি
   গ) স্রোতজ বনভূমি ঘ) কোনটিই নয়

২. নীচের অনুচ্ছেদটি লক্ষ্য করুন।
   i) যে কোন দেশের জন্য মোট বনভূমির শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।
   ii) উপকূলীয় অঞ্চলের বনভূমি সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
   iii) প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহে ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি দেখতে পাওয়া
   iv) কোনটিই নয়
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. যে কোনো দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট ভূমির কতভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
   (ক) ২০ ভাগ (খ) ২৫ ভাগ (গ) ৩০ ভাগ (ঘ) ৩৫ ভাগ

৪. খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানাটি কোন কাঠের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে?
   ক. সুন্দরী কাঠ খ. গরান কাঠ
   গ. গেওয়া কাঠ ঘ. চাপালিশ কাঠ

৫. চামড়া পাকা করার জন্য চামড়া শিল্পে কী ব্যবহৃত হয়?
   ক. সুন্দরবনের গরান ও বাবুল গাছের বাকল খ. সুন্দরবনের গোলপাতা
   গ. সুন্দরবনের গেওয়া গাছের পাতা ঘ. গর্জন, সেগুন ও চাপালিশ গাছের বাকল

পাঠ-১০.৩ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ এবং গুরুত্ব (Mineral Resources of Bangladesh and its Importance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- খনিজ সম্পদসমূহের উত্তোলনের পরিমাণ ও মজুদ সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- মানচিত্রে খনিজ সম্পদসমূহের অবস্থান দেখাতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের খনিজ সম্পদসমূহের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কঠিন শিলা।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলা গুরুত্বপূর্ণ। (চিত্র: ১০.৩.১) এছাড়া অন্যান্য খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে খনিজ বালু, চীনামাটি, সিলিকাবালু প্রভৃতি।

খনিজ তেল (Petroleum) : বাংলাদেশের সিলেট জেলার হরিপুরে ১৯৮৬ সালে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে। এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল উত্তোলন করা হয়। অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের তেল শোধনাগারে পরিশোধন করা হয়। পরিশোধিত তেল থেকে কোরোসিন, বিটুমিন, পেট্রোল ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি অবস্থিত (চিত্র-১০.৩.১)। দৈনিক প্রায় ১,২০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয় এই তেলক্ষেত্রটি থেকে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) সমগ্র বাংলাদেশের জ্বালানি তেল মজুদ ব্যবস্থা উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, বিপনন ও জ্বালানি তেল আমদানি ও মজুদ করে থাকে।

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) : বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের মোট ব্যণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭৩ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে। বাংলাদেশের মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৫টি। এ সকল গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর উত্তোলন যোগ্য মোট মজুদের পরিমাণ ২৭.০৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১.৭২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ১৫.৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনযোগ্য মজুদ রয়েছে। বর্তমানে মোট ২০টি গ্যাস ক্ষেত্রে ৯০টি কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে।

সারণি : ১০.৩.১ বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ

উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ	উৎপাদনে যায় নাই গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ	উৎপাদনে স্থগিত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ	নতুন আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ
বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা, রশিদপুর, সিলেট, তিতাস, নরসিংদী, মেঘনা, সাঙ্গু, সালদানদী, জালালাবাদ, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বিবিয়ানা, বাঙ্গুরা, শাহবাজপুর, সেমুতাং, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল	বেগমগঞ্জ, কুতুবদিয়া	ছাতক, কামতা, ফেনী	সুন্দলপুর, শ্রীকাইল

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪

কয়লা : কয়লা সম্পদে বাংলাদেশ তেমন উন্নত নয়। বাংলাদেশে প্রধানত বিটুমিনাস, লিগনাইট ও পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের ফরিদপুরে বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলা বিল এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে পিট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লা পাওয়া গেছে যথাক্রমে রাজশাহী, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় (চিত্র- ১০.৩.১)। বিটুমিনাস ও লিগনাইট উৎকৃষ্ট মানের কয়লা এবং পিট জাতীয় কয়লা নিম্নমানের। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া থেকে লিগনাইট কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে এবং এর পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন। বাংলাদেশে আবিষ্কৃত মোট ৫টি কয়লা ক্ষেত্রে মজুদের পরিমাণ প্রায় ২,৭০০ মিলিয়ন টন (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১২)।

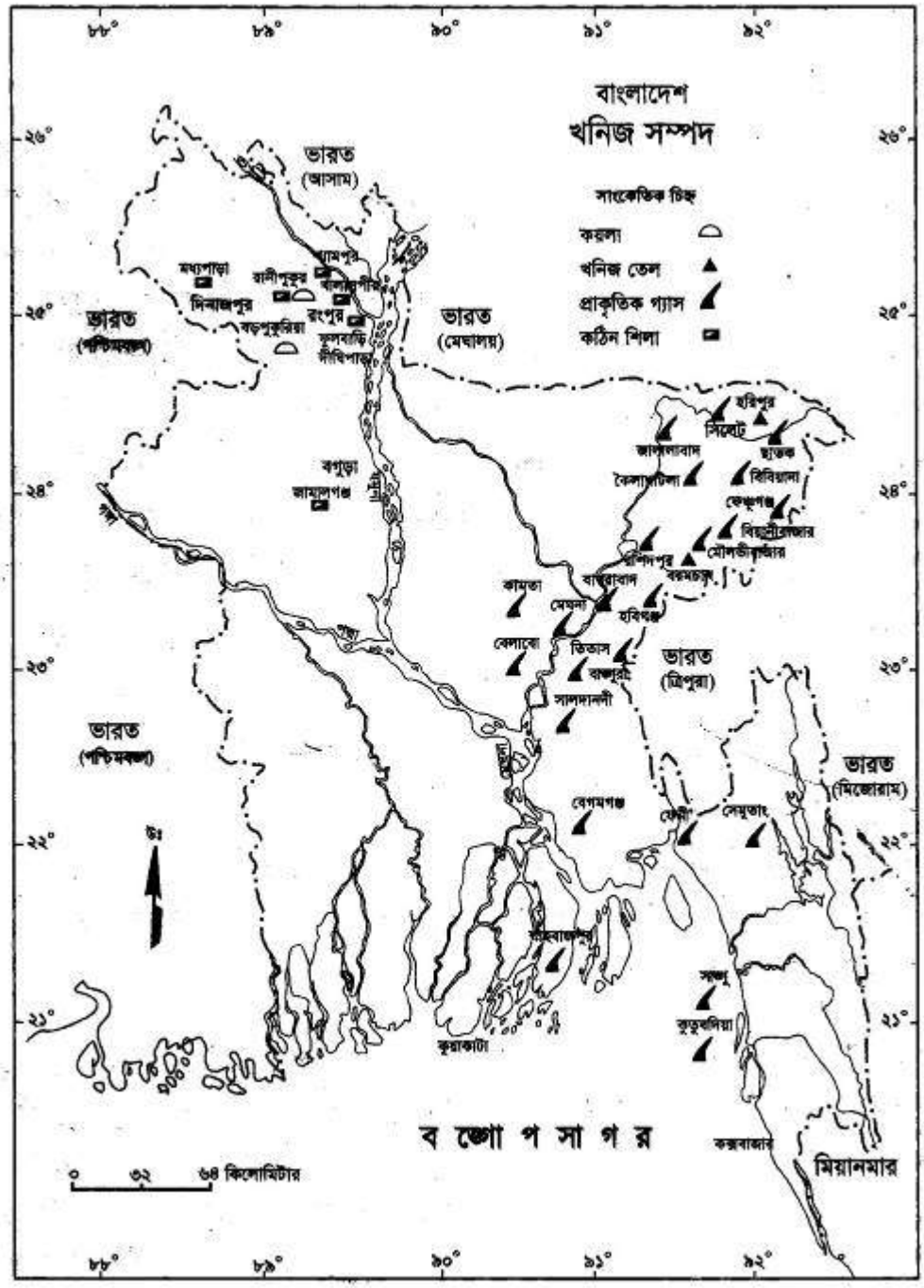

চিত্র- ১০.৩.১ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

কঠিন শিলা (Hard Rock) : রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুর এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হতে ২০১২ পর্যন্ত উত্তোলিত পাথরের পরিমাণ প্রায় ১,৮১১ লক্ষ মেট্রিক টন (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১২)।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব

প্রাকৃতিক গ্যাস : বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, বাণিজ্যিক, শিল্প ও গৃহস্থালী খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস। ফেঞ্চুগঞ্জের সার কারখানা ও ছাতকের সিমেন্ট কারখানায় সিলেটের হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। কুমিল্লার ঘোড়াশালের সার কারখানায় তিতাস গ্যাস কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সিলেটের চা বাগানগুলো রশিদপুরের প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। সিদ্ধিরগঞ্জ, আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কুমিল্লায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস

গ্যাস ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক, ঔষধ, রাবার, প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। সারণি ১০.৩.২-এ বিভিন্ন খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের শতকরা দেখানো হলো।

সারণি ১০.৩.২ : খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার (২০১৩-২০১৪)

খাত	শতকরা (%)
বিদ্যুৎ	৪১
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৭
ইন্ডাস্ট্রিজ	১৭
গৃহস্থালী	১১
সারকারখানা	৮
সি.এনজি	৫
বাণিজ্যিক	১

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪, পৃ: ১৫০

খনিজ তেল : শক্তি, আলো ও তাপ উৎপাদনের জন্য খনিজ তেল প্রয়োজনীয়। দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়। খনিজ তেল পরিশোধিত করে গ্যাসোলিন, ডিজেল গ্যাস, কেরোসিন, পিচ্ছিলকারক তেল (Lubricant), প্যারাফিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ ও বিমান চালাতে পেট্রোল ও ডিজেল ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের তেল ক্ষেত্রগুলো হতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল উত্তোলিত হলে এককভাবে জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ও হ্রাস করা সম্ভব।

কয়লা : বাংলাদেশের দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া থেকে উত্তোলিত কয়লার ৬৫ শতাংশ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকী ৩৫ শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে ইটভাটা, কল-কারখানাসহ অন্যান্য খাতে। কয়লা জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ও লাকড়ির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে বনজ সম্পদ রক্ষা ও দূষণ রোধে সাহায্য করে এবং দেশের সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে সাদামাটি (চীনা মাটি) ব্যবহৃত হয়। কাঁচ শিল্পের জন্য কাঁচামাল হিসাবে সিলিকাবালি ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খনিজ সম্পদ প্রয়োজন। এই বিষয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রদান করবেন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদগুলো হলো- খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলা। এছাড়া রয়েছে খনিজ বালু, চীনামাটি, সিলিকাবালু। বাংলাদেশের সিলেট জেলার হরিপুরে এবং মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে খনিজ তেল ক্ষেত্রসমূহ অবস্থিত। উভয় ক্ষেত্র থেকে দৈনিক ১৮০০ ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ। দেশের মোট বাণিজ্যিক ব্যবহারের ৭৩ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে। মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৫টি। এবং উত্তোলনযোগ্য মোট মজুদের পরিমাণ ২৭.০৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর অধিকাংশই সিলেট বিভাগে অবস্থিত। কয়লা সম্পদে বাংলাদেশ তেমন উন্নত নয়। বাংলাদেশে প্রধানত বিটুমিনাস, লিগনাইট ও পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে আবিস্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রের মজুদের পরিমাণ প্রায় ২,৭০০ মিলিয়ন টন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে খনিজ সম্পদসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের সিলেট জেলার হরিপুরে কত সালে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে?
ক. ১৯৮৫ সালে খ. ১৯৮৬ সালে গ. ১৯৮৭ সালে ঘ. ২০০০ সালে

৩. দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের কত শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে?
ক. প্রায় ৭০ শতাংশ খ. প্রায় ৭১ শতাংশ গ. প্রায় ৭২ শতাংশ ঘ. প্রায় ৭৩ শতাংশ

৪. দিনাজপুর জেলার কোথায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে?
ক. মধ্যপাড়ায় খ. ঠাকুরগাঁও গ. পঞ্চগড় ঘ. নীলফামারী

৫. ছাতকের সিমেন্ট কারখানায় কী ব্যবহৃত হয়?
ক. হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস খ. ফেঞ্চুগঞ্জের প্রাকৃতিক গ্যাস
গ. রশিদপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. বিয়ানীবাজারের প্রাকৃতিক গ্যাস

পাঠ-১০.৪ বাংলাদেশের প্রধান শিল্প ও বন্টন
Major Industries of Bangladesh and its Distribution

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- শিল্পসমূহের অবস্থান লিখতে পারবেন এবং মানচিত্রে অবস্থান সনাক্ত করতে পারবেন এবং
- শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ শিল্প, সার শিল্প।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প ও বন্টন

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও শিল্পায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জি.ডি.পি. তে শিল্পখাতের অবদান ছিল শতকরা ২৯.৬১ ভাগ। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার পূর্বশর্ত দেওয়া হয়েছে শিল্পায়নকে (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১০৭)।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হলো- পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ শিল্প, সার শিল্প, প্রভৃতি (চিত্র : ১০.৪.১)।

পাট শিল্প (Jute Industry) : বাংলাদেশে কৃষি নির্ভর শিল্পগুলোর মধ্যে প্রধান শিল্প হচ্ছে পাট। পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশ উৎকৃষ্ট শ্রেণির পাট উৎপাদনকারী দেশ। ১৯৫১ সালের পূর্বে এ দেশে একটিও পাটকল ছিল না। পাটকলগুলো স্থাপিত হয়েছিল কলকাতার আশেপাশে। এইসব কলসমূহে কাঁচাপাট সরবরাহ হত বাংলাদেশের পাটবলয় অর্থাৎ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে। ১৯৫১ সালে নারায়নগঞ্জে ১০০ তাঁত নিয়ে এ দেশের প্রথম পাটকল 'আদমজী পাটকল' স্থাপিত হয়। বর্তমানে আদমজী পাটকলটি বন্ধ রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি মোট পাটকলের সংখ্যা ২০৫টি। গড় বার্ষিক উৎপাদন ৬,৬৩,০০০ মেট্রিক টন।

পাটশিল্পজাত দ্রব্য : চট, বস্তা, কার্পেট, দড়ি, ব্যাগ, সান্ডেল, পুতুল, শোপিস, জুটন ইত্যাদি।

বাংলাদেশের পাট শিল্প কেন্দ্রিক অঞ্চলসমূহ : নারায়নগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম, ডেমরা, ঘোড়াশাল, নরসিংদী, ভৈরববাজার, গৌরীপুর, মাদারিপুর, চাঁদপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

পাটশিল্পজাত পণ্যের আমদানিকারকদেশসমূহ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মিশর, রাশিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ইতালি, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স।

বস্ত্রশিল্প (Cotton Textile Industry) : বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হচ্ছে কার্পাস বয়নশিল্প। মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হচ্ছে বস্ত্র। কিন্তু বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তুলা ও সুতা দিয়ে বাংলাদেশের সুতা ও বস্ত্রকলগুলো পরিচালিত হয়। জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলাদেশ প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্ত্র ও সুতা আমদানি করে। বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পগুলো মূলত ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী ও খুলনা জেলায় অবস্থিত।

ঢাকা বিভাগের বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রসমূহের অবস্থান : ঢাকার মিরেরবাগ, পোস্তগোলা, শ্যামপুর, ডেমরা, সাভার, নরায়ণগঞ্জ, মুড়াপাড়া, কাঁচপুর, ধমগড়, লক্ষণখোলা, ফতুল্লা, টঙ্গী, জয়দেবপুর, কালিগঞ্জ, নরসিংদী, মাধবদী, বাবুরহাট ও ঘোড়াশাল।

চট্টগ্রামের বিভাগ : ফৌজদারহাট, উত্তর কাট্টলি, ষোলশহর, পাঁচলাইশ, জুবলী রোড, হালিশহর কালুরঘাট।

কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল : কুমিল্লার দুর্গাপুর, দৌলতপুর, হালিমানগর, আরিগোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাঞ্ছারামপুর, নোয়াখালী অঞ্চলের ফেনী ও রায়পুর।

রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চল : রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা। রংপুর বিভাগে দিনাজপুর এবং খুলনা বিভাগে কুষ্টিয়া, মাগুরা ও যশোর জেলায় নোয়াপাড়া।

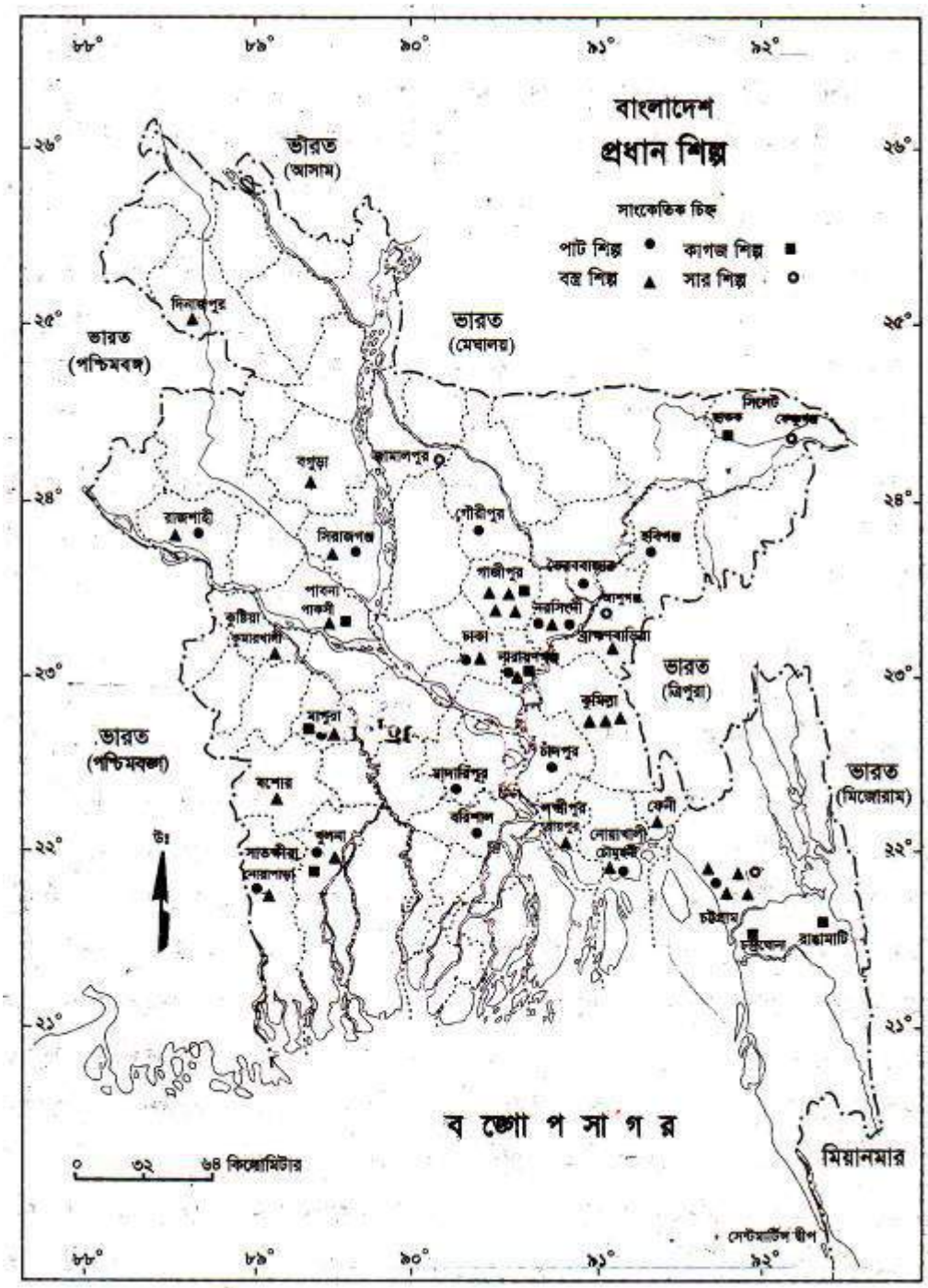

চিত্র- ১০.৪.১ বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

কাগজ শিল্প : কাগজ শিল্প বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্প। ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশের চন্দ্রঘোনায় প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে ৬টি কাগজকল, ৪টি বোর্ড মিলস ও ১টি নিউজপ্রিন্ট কারখানা আছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে অনেক কাগজকল রয়েছে।

কাগজকলে ব্যবহৃত কাঁচামাল : বাঁশ, নরম কাঠ, নলখাগড়া, আখের ছোবড়া, পাটকাঠি ও কাঁচা পাট।

উৎপন্ন কাগজ : লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট উল্লেখযোগ্য।

সার শিল্প (Fertilizer Industry) : বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সার শিল্পের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে প্রথম সারকারখানা

সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ১৭টি সার কারখানা থেকে সার উৎপাদন হচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান সার কারখানা গুলো হলো- ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ সার কারখানা, পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা, জামালপুর জেলার তারাকান্দিতে যমুনা সার কারখানা ও ফেঞ্চুগঞ্জ অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কারখানা উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা তার নিজ এলাকায় কোন কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করুন এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

সারসংক্ষেপ :

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হচ্ছে- পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ শিল্প ও সার শিল্প। কৃষিপ্রধান শিল্পগুলোর মধ্যে পাট শিল্প প্রধান। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে পাটকলের সংখ্যা ২০৫টি। দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হচ্ছে কার্পাস বয়ন শিল্প। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পগুলো মূলত ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী ও খুলনা জেলায় অবস্থিত। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সার শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। বর্তমানে ১৭টি সারকারখানা থেকে সার উৎপাদন হচ্ছে। তন্মধ্যে ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, পলাশ ইউরিয়া, চট্টগ্রাম ইউরিয়া, যমুনা সারকারখানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিল্পজাত পণ্যসমূহ মূলত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মিশর, রাশিয়া, ইতালি, কানাডা, জার্মান, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও শিল্পায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার জন্য পূর্বশর্ত দেওয়া হয়েছে। শিল্পায়নের সমৃদ্ধিকে বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হলো- পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ শিল্প ও সার শিল্প।
নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

১. ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে জি.ডি.পিতে শিল্পখাতের অবদান শতকরা কতভাগ?
   ক) ২৯.৬১ ভাগ (খ) ৩০.৫১ ভাগ
   গ) ৩৯.৬১ ভাগ (ঘ) ৪০.৫১ ভাগ
২. এই দেশের প্রথম প্রতিষ্ঠিত পাটকলটির নাম কী?
   ক. আদমজী পাটকল খ. ডেমরা পাটকল
   গ. শীতলক্ষা পাটকল ঘ. সিদ্ধিরগঞ্জ পাটকল
৩. বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে মোট পাটকলের সংখ্যা কত?
   ক. ২০০টি খ. ২০৫টি
   গ. ২১০টি ঘ. ২১৫টি
৪. বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কোনটি?
   ক. কার্পাস বয়ন শিল্প খ. কাগজ শিল্প
   গ. পাট শিল্প ঘ. রেশম শিল্প
৫. বাংলাদেশের চন্দ্রঘোনায় কাগজ কলটি কবে স্থাপিত হয়?
   ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৫১ সালে
   গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯৫৩ সালে

পাঠ-১০.৫ বাংলাদেশের পোশাক শিল্প (Garment Industry of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	পোশাক শিল্প।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু। এরপর থেকে এ শিল্প অতিদ্রুত বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে অবস্থান। এ শিল্পকে এখন বলা হয় 'বিলিয়ন ডলার' শিল্প। ২০১৩-২০১৪ সালে এ শিল্পে বাংলাদেশ ৮,২২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৪১.৫ ভাগ ।

সারণি : ১০.৫.১ মোট রপ্তানিতে তৈরি পোশাকের শতকরা হার

সাল	মোট রপ্তানিতে তৈরি পোশাকের শতকরা হার
২০১১-১২	৩৯.৫
২০১২-১৩	৪০.৮
২০১৩-১৪	৪১.৫

তৈরি পোশাকের রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সাল	রপ্তানি আয়
২০১১-১২	৯৬০৩
২০১২-১৩	১১০৪০
২০১৩-১৪	৮২২৮

(উৎস: বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪)

বর্তমানে বাংলাদেশের অনেকগুলো রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এগুলোর প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত। অবশিষ্টগুলো প্রায় সবই চট্টগ্রাম বন্দর নগরীতে এবং কিছু খুলনা এলাকায় রয়েছে (চিত্র-১০.৫.১)। বন্দর সুবিধা, স্বল্প মজুরিতে শ্রমশক্তির প্রাপ্যতা, সরকারের সহযোগিতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসমূহ পোশাক শিল্পের সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে দেশী মালিকানা, বিদেশী মালিকানা ও যৌথ মালিকানায় দেশী ও বিদেশী পোশাক শিল্প-কারখানা রয়েছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার পোশাক শিল্পসমূহে জাপান, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা প্রভৃতি দেশ বিনিয়োগ করছে।

উৎপাদিত পোশাক : ট্রাউজার, জিন্সপ্যান্ট, স্কার্ট, টপস, সোয়েটার, জ্যাকেট, মেয়েদের পুলওভার, কার্ডিগান, ব□াউজ, টি-শার্ট ও প্যান্ট।

রপ্তানিকৃত দেশসমূহ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন ও যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে পণ্য রপ্তানি করা হয়।

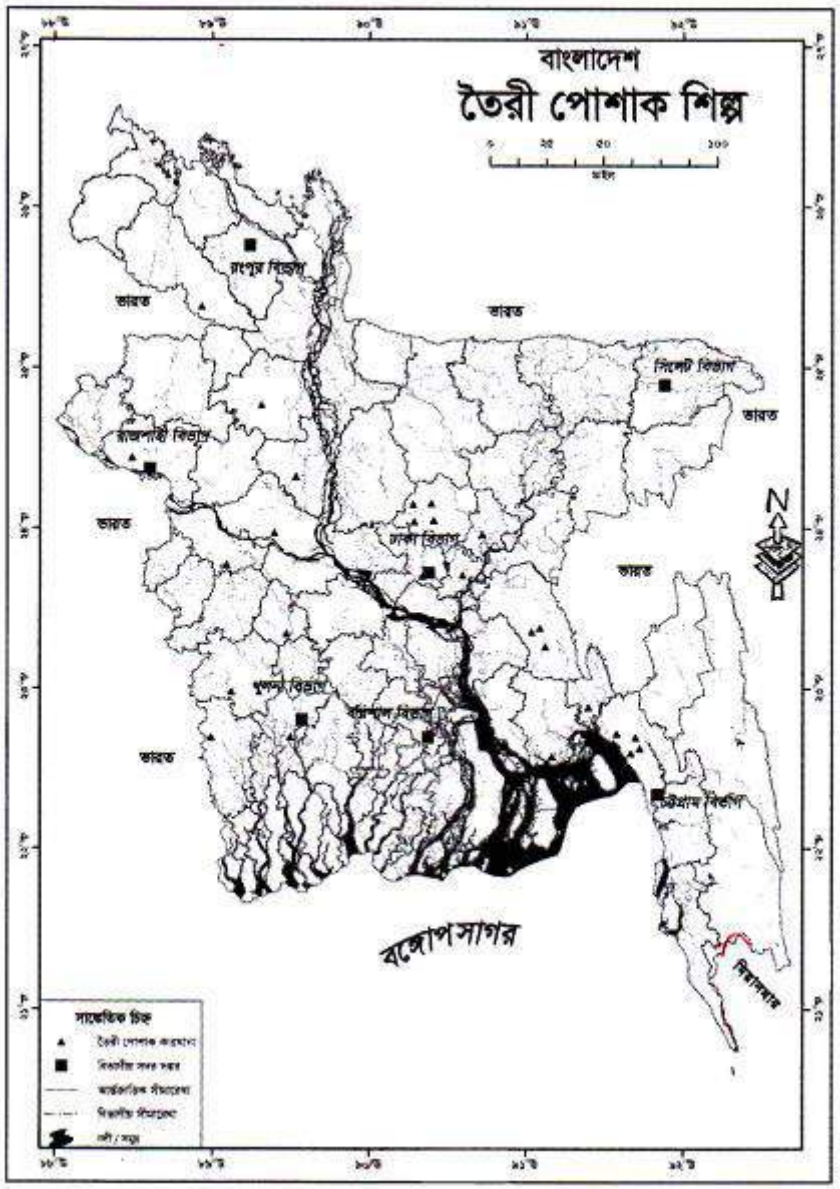

চিত্র ১০.৫.১ ঃ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পসমূহের অবস্থান

বাংলাদেশে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কোনো রপ্তানিযোগ্য তৈরি পোশাক শিল্প ছিল না। যদিও অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য ষাটের দশক থেকেই পোশাক তৈরি হত। সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম দিকে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু। প্রথম দিকে এ শিল্প খুবই ধীর গতিতে বেড়েছে। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তৈরি পোশাক শিল্প ইউনিট ছিল মাত্র ৯২টি। ১৯৮৪ সালে এ সংখ্যা দাড়ায় ৫৪৭ এ। ২০০৪ সালে ১৭০০ টিরও বেশি পোশাক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ১,৪৮,৩৪৫টি পোশাক শিল্প কারখানা মূলত বেসরকারি খাতে বিস্তৃত। দেশে বর্তমানে সরকারি খাতে ২২টি, বেসরকারি খাতে ৩৯২টি কটন স্পিনিং মিল, ৭৮২টি উইভিং মিল, ১,০৬৫টি স্পেশালাইড টেক্সটাইল ও পাওয়ার লুম ইউনিট, ৩,০০০টি নীটিং এবং ৩১৫টি ডায়িং প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং ইউনিট রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উৎপাদিত মোট সুতার পরিমাণ ৮০১.৩২ মিলিয়ন কেজি যার মধ্যে বেসরকারি খাতে উৎপাদনের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন কেজি এবং মোট কাপড় উৎপাদনের (৩,৫৫০ মিলিয়ন মিটার) সম্পূর্ণই বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪)।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? দলগতভাবে তালিকা তৈরি করে সেগুলো থেকে দলনেতা চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং টিউটরকে প্রদান করবেন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে বলা হয় 'বিলিয়ন ডলার' শিল্প। অধিকাংশ বস্ত্র খাতে সুতা ও কাপড়ের উৎপাদন এবং এ সংক্রান্ত শিল্প-কারখানা অধিকাংশ বেসরকারি খাতে বিস্তৃত। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে উৎপাদিত মোট সুতার পরিমাণ ৮০১.৩২ মিলিয়ন কেজি যার মধ্যে বেসরকারি খাতে উৎপাদনের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন কেজি এবং এই সময়ে মোট কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৩,৫৫০ মিলিয়ন মিটার। যার পুরোটাই বেসরকারিখাতে উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত পোশাকসমূহের মধ্যে রয়েছে ট্রাউজার, জিন্সপ্যান্ট, স্কার্ট, টপস, সোয়েটার, জ্যাকেট, মেয়েদের পুলওভার, কার্ডিগান, ব□াউজ, টি-শার্ট, প্যান্ট প্রভৃতি। এই সকল পণ্য রপ্তানি হয় মূলত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন ও যুক্তরাজ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিলিয়ন ডলার শিল্প বলা হয় কাকে?
   ক. পোশাক শিল্প খ. পাট শিল্প
   গ. কাগজ শিল্প ঘ. সার শিল্প

২. ২০১৩-১৪ সালে পোশাক শিল্প থেকে কত মিলিয়ন আয় করে?
   ক. ৮২২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খ. ৮৩২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
   গ. ৮৪২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘ. ৭০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

৩. ১৯৮৩ সালে পোশাক শিল্প ইউনিট ছিল কতটি?
   ক. ৯০টি খ. ৯২টি
   গ. ৯৪টি ঘ. ৯৬টি

৪. বর্তমানে শিল্প ইউনিটের সংখ্যা কত?
   ক. ১,৪৮,৩৪২টি খ. ১,৪৭,৩৪২টি
   গ. ২,৪৮,৩৪৫টি ঘ. ১,৬৬,৩৪২টি

৫. বাংলাদেশের মোট রপ্তানিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পোশাক শিল্পের অবদান শতকার কতভাগ?
   ক. ৪০.৫ ভাগ খ. ৪১.৫ ভাগ
   গ. ৩৯.৮ ভাগ ঘ. ৩০.৯৭ ভাগ

পাঠ-১০.৬ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প (Tourism Industry of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক পর্যটন স্থানসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	পর্যটন।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্রসৈকত, ঘন অরণ্য, পাহাড়ি এলাকা প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশে রয়েছে। এগুলোর সবই পর্যটন শিল্পের জন্য সম্ভাবনাময়। দেশের উল্লেখযোগ্য মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুময় সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, দ্বীপ, হ্রদ, সবুজ-শ্যামল পাহাড়ি ভূমি, বগা লেক, পুকুরপাড়া লেক প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও মঠসহ প্রাচীন অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেমন- ময়নামতি, সোমপুর বিহার, সোনারগাঁও, লালবাগ কেল্লা, পাহাড়পুর। এছাড়া রয়েছে সিলেটের পাহাড়সমূহ, চা বাগানের নয়নাভিরাম নৈসর্গিক দৃশ্য, পটুয়াখালির কুয়াকাটার সমুদ্রসৈকতে একই সাথে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য, বান্দরবনের নীলাচল যেখানে থেকে মেঘ স্পর্শ করা যায়, রাঙামাটির সুবিশাল কাপ্তাই লেক, সিলেটের হাওড় অঞ্চল, প্রাকৃতিক ঝরনার মাধবকুন্ড, প্রভৃতি সবই আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান। এই সকল স্থান দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রসমূহ

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ একটি দেশ। তাই বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানেই রয়েছে পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় উপাদান। বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানসমূহ হলো-

১. ঢাকা বিভাগের পর্যটন স্থানসমূহ।
২. পূর্বাংশের পর্যটন স্থানসমূহ।
৩. উত্তাংশের পর্যটন স্থানসমূহ।
৪. দক্ষিণাংশের পর্যটন স্থানসমূহ।
৫. রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পর্যটন স্থানসমূহ।
৬. চট্টগ্রামের পর্যটন স্থানসমূহ
৭. কক্সবাজার এলাকার পর্যটন স্থানসমূহ। (চিত্র- ১০.৬.১)

ঢাকা বিভাগের পর্যটন স্থানসমূহ : বাংলাদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর হলো ঢাকা। ঢাকা বিভাগের পর্যটন কেন্দ্রসমূহ হলো- সাত-গম্বুজ মসজিদ, তারা মসজিদ, বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির। লালবাগ দুর্গ, বাহাদুর শাহ পার্ক, আহসানমঞ্জিল, জাদুঘর, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্যসমূহ, জাতীয় কবির সমাধি, জাতীয় সংসদ ভবন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতি সৌধ, মীরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধ, রায়েরবাজার বধ্যভূমি, ধানমন্ডির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতি ও মিউজিয়াম, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণস্থল, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইত্যাদি পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ। গাজীপুরের ভাওয়াল গড় ও জমিদারবাড়ি, নারায়ণগঞ্জের ঐতিহাসিক সোনারগাঁও, পানামা নগর এবং ওয়ারী বটেশ্বর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

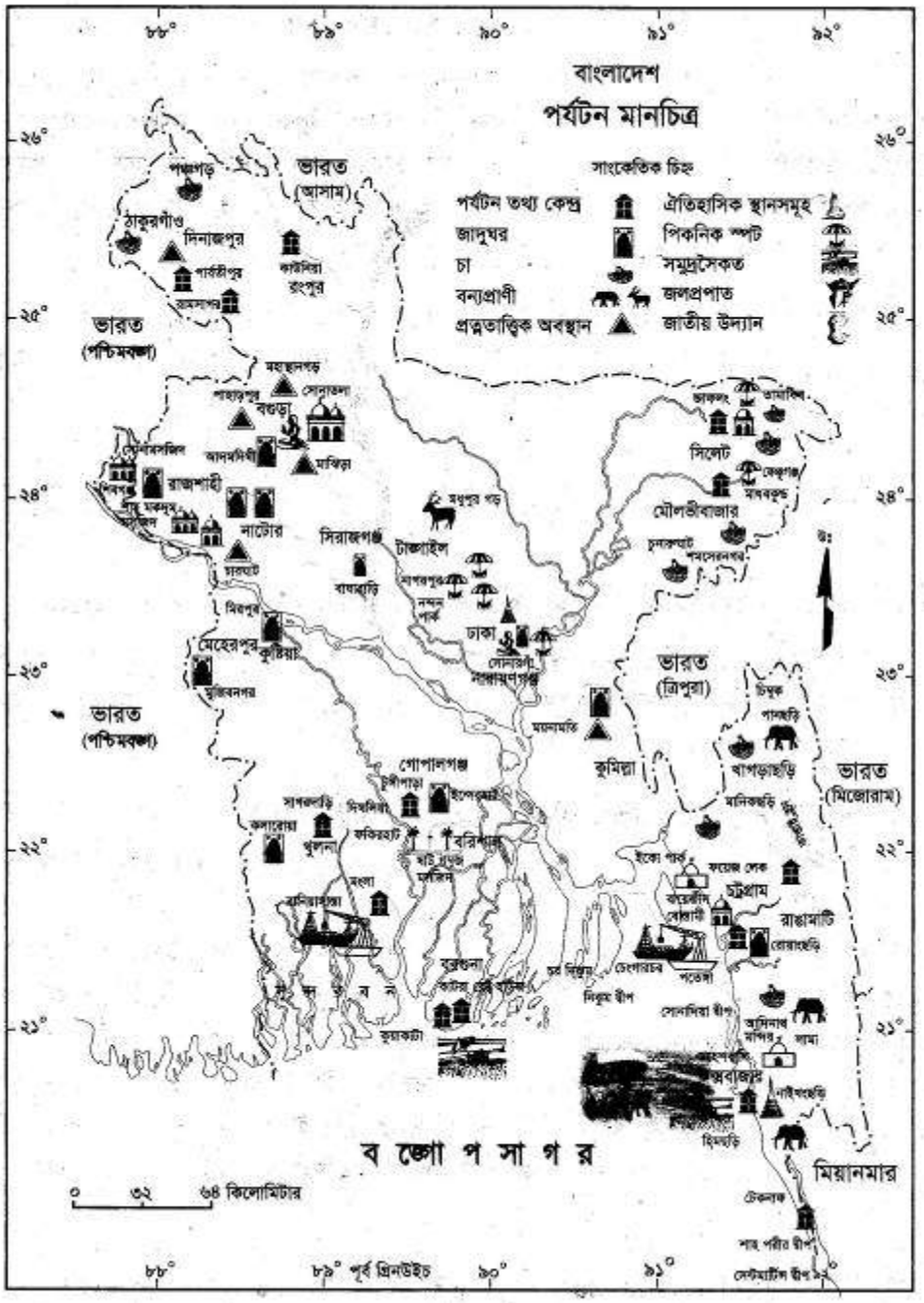

চিত্র ১০.৬.১ বাংলাদেশের পর্যটন স্থানসমূহ

পূর্বাংশের পর্যটন স্থানসমূহ : টাঙ্গাইলের অ্যান্টিয়া মসজিদ, মওলানা ভাসানীর মাজার ও বঙ্গবন্ধু সেতু, মধুপুরের নজরুল ইসলাম এর স্মৃতি বিজরিত দরিরামপুর। সিলেটের হযরত শাহজালাল ও শাহপরান(রা:) মাজার, কিন ব্রিজ, জাফলং-এ জয়ন্তিয়া পাহাড়, মৌলভীবাজারের মাধবকুন্ড, লাউয়াছড়া ইকোপার্ক। কুমিল্লার ময়নামতি বৌদ্ধ ও শালবন বিহার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের সমাধিস্থল, নোয়াখালীর গান্ধী আশ্রম, হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের উত্তরাংশের পর্যটন স্থানসমূহ : রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর ও শাহ মখদুম (রা:) মাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে সোনা মসজিদ, নাটোরের রাণী ভবানীর বাড়ি ও দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি, নওগাঁয় পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড় ও শাহ সুলতান বলখী (রা:) মাজার, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির।

দক্ষিণাংশের পর্যটন স্থানসমূহ : গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজার, মরমী কবি লালন শাহের মাজার ও শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, যশোরের সাগরদাড়িতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান, নড়াইলে চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান শিশু স্বর্গ ও আর্ট গ্যালারী, চিত্রা নদীর তীর, মেহেরপুরে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদ, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, বৃহত্তর খুলনায় অবস্থিত প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, সুন্দরবন ইত্যাদি।

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পর্যটন স্থানসমূহ : রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদ, বৌদ্ধ বিহার ও চাকমা রাজার রাজবাড়ি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। খাগড়াছড়িতে রয়েছে পাহাড়, প্রাকৃতিক ঝরনা এবং বনভূমি, বান্দরবানের মেঘলা, শৈলপ্রপাত, নীলগিরি, নীলাচল পর্যটন স্পট হিসাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই অঞ্চলে অবস্থিত বগা লেক ও পুকুরপাড়া লেক অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ হতে পারে।

চট্টগ্রামের পর্যটন স্থানসমূহ : ফয়েজ লেক, ডিসিহিল, কোর্ট বিল্ডিং, পতেঙ্গা, সমুদ্রসৈকত, সীতাকুন্ড, হযরত শাহ আমানত (রা:) মাজার প্রভৃতি চট্টগ্রামের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান।

কক্সবাজার এলাকার পর্যটন স্থানসমূহ : পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত হলো কক্সবাজার। কক্সবাজারের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানসমূহ হলো, হিমছড়ি, ইনানি সৈকত, কলাতলি সৈকত, রামু বৌদ্ধ মন্দির, সেন্টমার্টিন, মহেশখালী ও সোনাদিয়া দ্বীপ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের পর্যটন স্থানসমূহের মধ্যে ঐতিহাসিক পর্যটন স্থান এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত পর্যটন স্থানসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ :

প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশে রয়েছে সমুদ্রসৈকত, ঘনঅরণ্য, পাহাড়ি এলাকা প্রভৃতি। এছাড়াও রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধবিহার মঠসহ প্রাচীন অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেমন- ময়নামতি, সোমপুর বিহার, সোনারগাঁও, লালবাগ কেল্লা, পাহাড়পুর। বাংলাদেশের অঞ্চল ভিত্তিক পর্যটন স্থানসমূহকে মোট ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা: ঢাকা বিভাগের পর্যটন স্থানসমূহ, পূর্বাংশের পর্যটন স্থানসমূহ, দক্ষিণাংশের পর্যটন স্থানসমূহ, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানের পর্যটন স্থানসমূহ, চট্টগ্রামের পর্যটন স্থানসমূহ এবং কক্সবাজার অঞ্চলের পর্যটন স্থানসমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের পর্যটন স্থানসমূহ কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
   ক. ৭ ভাগ খ. ৫ ভাগ গ. ৪ ভাগ ঘ. ৪ ভাগ

২. পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের নাম কী?
   ক. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত খ. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত
   গ. পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩. বাংলাদেশের কোন স্থান থেকে মেঘ স্পর্শ করা যায়?
   ক. নীলগিরি পাহাড় থেকে খ. খাগড়াছড়ির পাহাড়সমূহ থেকে
   গ. মাধবকুন্ড পাহাড় থেকে ঘ. সীতাকুন্ড পাহাড় থেকে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

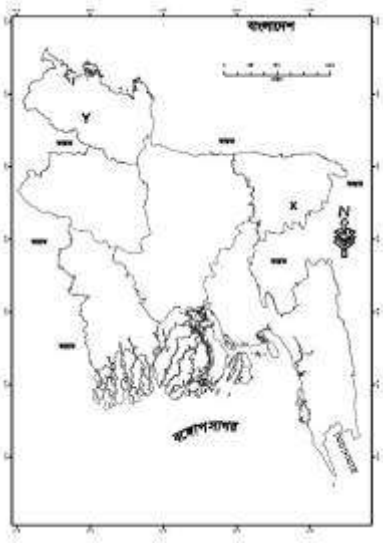

ক) X চিহ্নিত স্থানে কোন ধরনের বনভূমি গড়ে উঠেছে?
খ) উক্ত বনভূমি কোথায় গড়ে উঠে? উক্ত বনভূমির বৃক্ষসমূহের নাম লিখুন।
গ) উক্ত বনাঞ্চলের বিস্তৃতি ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উদ্দীপকের আলোকে উক্ত বনাঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরঃ

ক) 'X' চিহ্নিত স্থানের বনভূমির নাম স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।
খ) উক্ত বনভূমি সাধারণত স্রোতময় মিঠা ও লোনা পানির সংযোগস্থলে জন্মে। এই বনাঞ্চলের বৃক্ষসমূহের নাম হলো- সুন্দরি, গরান, গেওয়া, ধুন্দল, বেওড়া ও গোলপাতা।
গ) উত্তরে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলা; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে হরিণঘাটা নদী, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলা এবং পশ্চিমে রাইমঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা নদী ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আংশিক প্রান্তসীমা পর্যন্ত এ বনভূমি বিস্তৃত। এটি খুলনা বিভাগের ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।
ঘ) সমুদ্রের জোয়ার ভাটা ও লোনা পানি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য চিহ্নিত অঞ্চল বৃক্ষ সমৃদ্ধ।
কোনো দেশের পারস্পরিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট ভূমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১২-১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ। নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা-

১। প্রাকৃতিক গুরুত্ব : জীববৈচিত্র্য রক্ষা বা ভূমিক্ষয় রোধ, বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি, আবহাওয়া আর্দ্র রাখা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
২। পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা : সুন্দরবন পর্যটন শিল্পের জন্য সম্ভাবনাময় স্থান। এর জীববৈচিত্র পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
৩। পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ : দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাঁশ, বেত, মধু, মোম প্রভৃতি এ বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া জীবজন্তুর চামড়া ও ভেষজ দ্রব্য এ বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়।
৪। শিল্পের উন্নতি : খুলনার নিউজপ্রিন্ট কাগজ কারখানা সুন্দরবনের কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এছাড়া সুন্দরবনের গেওয়া কাঠের উপর নির্ভর করে দিয়াশলাই শিল্প গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনের গরান ও বাবুল গাছের বাকল চামড়া পাকা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
৫। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস : উপকূলীয় অঞ্চলের স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

মুনতাসিরের গ্রামের বাড়ি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেখানে এমন একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অন্যদিকে ফয়সালের গ্রামের বাড়ি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সেখানে এমন একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যার কাঁচামাল বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হয়।

ক) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্পটির নাম কি?
খ) বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
গ) ফয়সালের গ্রামের বাড়ি যে অঞ্চলে অবস্থিত ঐ এলাকায় গড়ে ওঠা শিল্পটি ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) মুনতাসিরের গ্রামের বাড়ি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে যে শিল্পটি গড়ে উঠেছে ঐ শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটুকু সে সর্ম্পকে মতামত প্রদান করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১: ১. (খ) ২.(গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২: ১. (ক) ২. (ঘ) ৩.(খ) ৪. (গ) ৫.(ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩: ১. (গ) ২. (খ) ৩.(ঘ) ৪.(ক) ৫.(ক) ৬.(খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪: ১. (ক) ২. (ক) ৩.(খ) ৪.(গ) ৫.(ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫: ১.(ক) ২. (ক) ৩. (খ) ৪. (ক) ৫. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬: ১.(ক) ২.(ক) ৩.(ক)।